Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাওমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদ হাসান

রোলঃ 227011481

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাওমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদ হাসান

রোলঃ 227011481

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাওমের গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাহিদ হাসান, আইডিঃ 227011481বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাওমের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নাহিদ হাসান

আইডিঃ 227011481

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
সাওমের অভিধানিক অর্থ: 7
সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা 9
যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওম 10
সংযম অর্জন 15
তাকওয়া অর্জন 16
আত্মিক ও দৈহিক সুস্থতা অর্জন 17
সুন্দর সমাজ গঠন 17
রমযান ও সাওমের ফযীলত 19
সাওম পালনকারীর জন্য জান্নাতে রাইয়্যান দরজা 25

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, তাঁর কাছে তাওবা করছি। তাঁর কাছে আমাদের অন্তরের সব কলুষিতা ও সব পাপ কাজ থেকে পানাহ চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না আর তিনি যাকে পথ-ভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তা সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করে। তিনি তাঁর রিসালাহ (দাওয়াত) পৌঁছেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহর পথে যথাযথ প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর উম্মতকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের রেখে গেছেন, যার দিবারাত্রি সমানভাবেই স্পষ্ট, একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ সে পথ থেকে সরে যায় না। তাই আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে যারা তাঁর অনুসরণ করবে সকলের ওপর বর্ষিত হোক। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কাজে তাঁর অনুসারী করেন। যিনি যেন তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। তাঁর উম্মতের কাতারে যেন হাশরের দিনে একত্রিত করেন। তাঁর শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তিনি যেন আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে তাঁর সাথে ও সে সব নবী রাসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীন বান্দাদের সাথে একত্রিত করেন যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [ال عمران: ١٠٢]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যথাযথ তাকওয়া। আর তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء: ١]

“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾ [الاحزاب: ٧٠، ٧١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল”। [সূরা: আল-আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য কিছু ইবাদত প্রবর্তন করে তাদের ওপর অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। যেহেতু তিনি সাওমকে বান্দাহর জন্য দূর্গ ও ঢাল স্বরূপ করেছেন। সাওমের মাধ্যমে তিনি জান্নাতের পথ সুপ্রশস্ত করেছেন। মানুষের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি দমন করে তাকে করেছেন পবিত্র। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগরণ, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কষ্ট উপলব্ধি, শারীরিক সুস্থতা, সর্বোপরি মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভ ইত্যাদি হলো সাওমের সওগাত। সাওমের অপরিসীম ফযিলতের কারণেই আল্লাহ বলেছেন, “সাওম আমার জন্য, আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব”

*সাওমের পরিচয়

সাওমের অভিধানিক অর্থ:

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহু বচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَة: الإمساكُ عَن الشيءِ والتَّرْكُ لَهُ. وَقيل للصائمِ صَائِم: لإمساكه عَن الْمطعم وَالْمشْرَب والمنكح.

“কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।”

وَقيل للصامت: صَائِم، لإمساكه عَن الْكَلَام. وَقيل للفرسِ: صَائِم، لإمساكه عَن العَلَف مَعَ قِيَامه.

“চুপ থাকা ব্যক্তিকে ‘সায়েম’ বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও ‘সায়েম’ বলা হয়।”

ইবন ‘আরাবী রহ. বলেছেন,

وصامَ الرجلُ: إِذا تَظَلَّلَ بالصَّوْم، وَهُوَ شجر؛ قالهُ ابْن الْأَعرَابِي.

“কোনো ব্যক্তি যখন গাছের নিচে ছায়া নিচ্ছে তাকে বলা হয় ‘সমার রজুল।” (লোকটি ছায়ায় থেকে চলাফেরা থেকে বিরত থেকেছে)।

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأكل وتَرْكُ الْكَلَام.

“সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা।” যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦﴾ [مريم: ٢٦]

“অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]

وَصَامَ الفَرَس على آرِيِّه: إِذا لم يَعْتَلِف. والصومُ: قِيَامٌ بِلَا عَمل. وصامَتِ الرِّيحُ: إِذا رَكَدَتْ.

“ঘোড়া যখন খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে বলা হয় ‘সমাল ফারাস’, আবার সাওম অর্থ কোনো কাজ না করা। বলা হয়, ‘সমাতির রিহ’ বাতাস যখন থেমে থাকে।”

সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُو الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الإنسانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ.

“সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠﴾ [الزمر: ١٠]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০][1]

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية.

وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

"সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।"[2]

কারও কারও মতে, 'সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলনে,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.

"সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থকার নাম হলো সাওম।"[3]

বদরুদ্দীন 'আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

"খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।"[4]শরী'আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার,যৌন সম্ভোগ ও শরী'আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী'আতে ঈমান,সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

>

[1] দেখুন, তাহযীবুল লুগাহ ১২/১৮২, লিসানুল 'আরব: ১২/৩৫০।

[2] আল-কামুসুল ফিকহি, পৃ: ৩৫০।

[3] তা'রিফাত লিল জুরজানী, পৃ: ১৭৮।

[4] আল বিনায়া শরহে হিদায়া, ৪/৩।

* সাওমের ইতিহাস

যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওম

সাওম বা রোযা নাম ও ধরণভেদে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহুল প্রচলিত একটি ধর্মীয় বিধান, যা মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় (ফরয) একটি ইবাদত। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওমের বিধান দেওয়া হয়েছে, তেমনি সাওমের বিধান দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতেও; পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধর্ম-কর্মেও। আসমানী ধর্ম ছাড়াও মানব রচিত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওমের বিধান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল 'সাওম' বা রোযা নামের এই ধর্মানুষ্ঠান।

তাফসীরে কুরতুবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে,

الْمَعْنَى:كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ أَيْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ- فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ مُعَاذُ بن جبل: نسخ ذلك ب أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ثُمَّ نُسِخَتِ الْأَيَّامُ بِرَمَضَانَ.

"আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও 'আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল। পরবর্তীতে রমযান মাসের দ্বারা এ সাওম রহিত হয়। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, উক্ত তিন দিনের সাওম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের সাওমের দ্বারা রহিত হয়। অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের সাওম আবার রমযানের সাওম দ্বারা রহিত হয়।[1]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আশুরার দিন সাওম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও পালন করেছে। পরে যখন রমযানের সাওম ফরয হলো তখন তা ছেড়ে দেওয়া

হয়। ‘আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ সাওম পালিন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারন সাওম পালন করতেন, তাঁর সাথে মিল হলে করতেন।[2]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

“জাহেলী যুগে কুরাইশগন ‘আশুরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সাওম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা ‘আশুরার সাওম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।”[3]

আমরা এখানে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিভিন্ন আসমানী ধর্মে ও মানব রচিত অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের যুগে যুগে সাওমের বিধান ও ধরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আদম আলাইহিস সালামের শরী‘আতে সাওম:

প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালামের শরী‘আতে সিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সিয়ামের ধরণ ও প্রকৃতি কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে বাইবেল, কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব একেবারে নিশ্চুপ। বলা হয়ে থাকে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর শরী‘আতেই চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়ামের বিধান ছিল। এ সাওম আইয়্যামে বীদ বা শুভ্ররাত্রিগুলোর দিনের সাওম নামে খ্যাত।

নূহ আলাইহিস সালামের সাওম:

তাফসীরে ইবন কাসীরে এসেছে,

قَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ يَصُومُونَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ أَوَّلًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -عَنْ مُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ. وَزَادَ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

“প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ মু‘য়ায, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, ‘আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ‘আতা, কাতাদা ও দাহহাক রহ. বর্ণনা করেন, নূহ আলাইহিস সালাম হতে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়ামের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ইহা রমযানের সাওম দ্বারা রহিত হয়।[4]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى»

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নূহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বাদে সারা বছর সাওম পালন করতেন।”[5]

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাওম:

মুসলিম মিল্লাতের পিতা সহিফাপ্রাপ্ত নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ৩০টি সাওম ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন।

দাউদ আলাইহিস সালামের সাওম:

আসমানী কিতাব ‘যবুর’ প্রাপ্ত বিখ্যাত নবী দাউদ আলাইহিস সালামের যুগেও সাওমের প্রচলন ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« «صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাওম দাউদ আলাইহিস সালামের সাওম -তিনি এক দিন সাওম পালন করতেন এবং এক দিন বিনা সাওমে থাকতেন”।[6]

মূসা আলাইহিস সালাম ও ইয়াহূদী ধর্মে সাওম:

ইয়াহূদীদের ওপর প্রতি শনিবার, বছরের মধ্যে মহররমের ১০ তারিখে আশুরার দিন এবং অন্যান্য সময় সাওম ফরয ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে ইয়াহূদীদের আশুরার দিনে সাওম অবস্থায় পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজকে তোমরা কিসের সাওম করছ?’ তারা বলল, ‘এটা সেই মহান দিন যেদিন আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওম বনী ইসরাইল ফির‘আউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মূসা আলাইহিস সালাম ঐ দিনে সাওম রেখেছিলেন, তাই আমরা আজকে সাওম করছি।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা

আলাইহিস সালামের অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিন সাওম পালন করেন এবং সবাইকে সাওম রাখার নির্দেশ দেন”।[7]

মূসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে আল্লাহর কাছ থেকে তাওরাতপ্রাপ্তির আগে ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করেছিলেন। ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বর্ণিত আছে, মূসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে ৪০ দিন পানাহার না করে কাটিয়েছিলেন। তাই ইয়াহূদীরা সাধারণভাবে মূসা আলাইহিস সালামের অনুসরণে ৪০টি সাওম রাখা ভালো মনে করত। তন্মধ্যে ৪০তম দিনটিতে তাদের ওপর সাওম রাখা ফরয ছিল। যা ইয়াহূদীদের সপ্তম মাস তিশরিনের দশম তারিখে পড়ত। এ জন্য ঐ দিনটিকে আশুরা বা দশম দিন বলা হয়। এ ছাড়া ইয়াহূদী সহিফাতে অন্যান্য সাওমেরও সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে। ইয়াহূদীরা বর্তমানে ৯ আগস্ট ইয়াহূদী হাইকাল বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস দিবসে সাওম রাখে, এ দিন তারা খাদ্য, স্ত্রী সহবাস ও জুতা পরিধান থেকে বিরত থাকে। এছাড়াও ১৩ নভেম্বর, ১৭ জুলাই, ১৩ মার্চ ও বিভিন্ন দিবসে সাওম পালন করে।

ঈসা আলাইহিস সালাম ও খ্রিস্টান ধর্মে সাওম:

আসমানী কিতাব ‘ইঞ্জিল’ প্রাপ্ত বিশিষ্ট নবী ‘ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে সাওমের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী সম্প্রদায় সাওম রাখতেন। বর্তমানে তাদের দু’ধরণের সাওম আছে।

প্রথম হলো, তাদের ফাদারের উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকা আর ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে। মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস খাওয়া যাবে না। যেমন, বড় দিনের সাওম, তাওবার সাওম যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারে সাওম।

দ্বিতীয় ধরণের সাওম হলো খাদ্য থেকে বিরত থাকা, তবে মাছ ভক্ষণ করা যাবে। এ সাওমের মধ্যে ছোট সাওম বা জন্মদিনের সাওম, ইহা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতগণের সাওম, মারিয়ামের সাওম ইত্যাদি। তবে তাদের ধর্মে কোনো সাওমই ফরয নয়; বরং কেউ ইচ্ছা করলে রাখতে পারে।

গ্রীক ও রোমানদের সাওম:

গ্রীস ও রোমানরা যুদ্ধের আগে সাওম রাখত যাতে ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টান পাদরীদের ও পারসিক অগ্নিপূজকদের এবং হিন্দু যোগী ইত্যাকার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাওমের বিধান ছিল। পারসিক ও হিন্দু যোগীদের সাওমের ধরন ছিল এরূপ -তারা সাওম থাকা অবস্থায় মাছ-মাংস, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত বটে; কিন্তু ফল-মূল এবং সামান্য পানীয় গ্রহণ করত। মূর্তিপূজক ঋষীরা সাওমের ব্যাপারে এতই কঠোর ছিল যে, তারা সাওম থাকা অবস্থায় মাছ-মাংস, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত, স্ত্রী

সহবাস করত না। সারা বছর সাওম রেখে আত্মার কষ্ট দিত আর এভাবে তারা পবিত্রতা অর্জনের সাধনা করত। প্রাচীন চীনা সম্প্রদায়ের লোকরা একাধারে কয়েক সপ্তাহ সাওম রাখত।

জাহেলী যুগে সাবে'ঈ সম্প্রদায়ের সাওম:

ইবন নাদিম তার 'ফিহরাসাত' কিতাবের নবম খণ্ডে উল্লেখ করেন, সাবে'ঈ সম্প্রদায়ের লোকেরা (যারা গ্রহ-নক্ষত্র পূজা করে) ত্রিশ দিন সাওম পালন করত। আযার মাসের ৮দিন অতিবাহিত হলে এ সাওম শুরু হতো, কানুনে আউয়াল মাসে ৯টি, শাবাত মাসে ৭টি সাওম। এ সাত সাওম পালনের পরে তারা ঈদুল ফিতর উদযাপন করত। সাওম অবস্থায় তারা খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকত।

হিন্দু ধর্মে সাওম বা উপবাস:

বেদের অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ উপবাস ছিল। প্রত্যেক হিন্দি মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর 'একাদশীর' উপবাস রয়েছে। এ হিসাবে তাদের উপবাস ২৪টি হয়। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবার উপবাস করেন। কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন। হিন্দু মেয়েরা তাদের স্বামীদের মঙ্গল কামনায় কার্তিক মাসের ১৮তম দিবসে 'কারওয়া চাওত' নামে উপবাস রাখে।

বৌদ্ধ ধর্মে সাওম বা উপবাস:

তারা তাদের চন্দ্রমাসের Upisata মাসে ১, ৯, ১৫ ও ২২ তারিখে ৪দিন উপবাস পালন করে। এছাড়া বৌদ্ধ গুরুরা দুপুরের খাবারের পর থেকে সব ধরণের খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তারা এভাবে খাদ্য থেকে বিরত থেকে সংযম ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ করে।

মংগোলীরা প্রতি ১০দিন অন্তর ও যারাদাশতিরা প্রতি ৫দিন অন্তর সাওম পালন করত।

জাহেলী যুগে সাওম:

ইসলামের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের আগে আরবের মুশরিকদের মধ্যেও সিয়ামের প্রচলন ছিল। যেমন আশুরার দিনে কুরাইশরা জাহেলী যুগে সাওম রাখত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগে ঐ সাওম রাখতেন।

ইসলামে সাওম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩] ইসলামে সাওমের রয়েছে কতিপয় শর্ত ও বৈশিষ্ট্য। সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদাতের নিয়তে যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। সাহরী খাওয়া ইসলামী শরী‘আতের সাওমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে রমযানের সাওম ফরয, অন্যান্য সাওম মুস্তাহাব, যেমন, ‘আরাফার সাওম, মহররমের সাওম, শবে বরাতের সাওম, প্রতি চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের সাওম ইত্যাদি।

[1] দেখুনঃ তাফসীরে কুরতবী: ২/২৭৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯২।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩।

[4] দেখুনঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/৪৯৭), তাফসীরে কুরতবীঃ (২/২৭৫), তাফসীরে ত্বাবারীঃ (৩/৪১১), তাফসীরে মানারঃ (২/১১৬।

[5] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৪, আলবানী রহ. বলেছেন হাদীসটি দ‘য়ীফ। কেননা এর সনদে ابن لهيعة রয়েছেন, যিনি দ‘য়ীফ।

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৯।

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০০৪, ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৩০।

*সাওমের তাৎপর্য

সংযম অর্জন

সাওমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে সংযম। মূলত সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সাওমের প্রচলন ছিল। ইসলামী শরী‘আতে ফরযকৃত সাওম সেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি

সহায়ক। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো সাওমের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ব্রতী হওয়া।

আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমযান মাস হলো ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ মাসেই আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যাতে রমযান পরবর্তী সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে, কথায় কাজে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই সাওম।

তাকওয়া অর্জন

সাওমের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

(لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ) যাতে তোমরা তাকওয়াবান হও। এখানেই সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাকওয়ার ভিত্তির ওপর যে সমাজ গঠিত হবে সেখানে থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, দুর্নীতি ও রাহাজানি। সাওমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রকার নাফরমানী কাজ থেকে দূরে থাকার নামই তাকওয়া। মানুষের মনের গোপন কোণে যে কামনা-বাসনা আছে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কেও জ্ঞাত। আল্লাহর কাছে বান্দার মান-মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র উপায় তাকওয়া। এ তাকওয়াই মানুষের মনে সৎ মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে। সুতরাং যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করতে পারলেই সাওম পালন সফল ও সার্থক হবে। এভাবে সাওম পালনের মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের একজন সৎ, আল্লাহভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকে হবে।

সাওম থেকে তাকওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাকওয়া অর্জন করার ক্ষেত্রে সাওমের কোনো বিকল্প নেই। সাওমের শিক্ষা নিয়ে তাকওয়ার গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করতে পারে। ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সাওম রাখলে

জীবনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ শিক্ষা যদি বাকি ১১ মাস কাজে লাগানো যেত, তাহলে পৃথিবীতে এত অশান্তি, অনাচার থাকত না। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

"যে সংশোধিত হলো, সেই সফলকাম হলো"। [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪]

আত্মিক ও দৈহিক সুস্থতা অর্জন

সাওম মানুষের ভেতর ও বাহির -দুই দিকের সংশোধন করে। মানুষের ভেতরের অবস্থা পরিবর্তন করা অর্থাৎ আলোকিত করা এবং তার স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ সংশোধনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা সাওমের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাওম মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়।
মানুষের শারীরিক অবকাঠামো ঠিক রাখতে বর্তমানে চিকিৎসকেরা সাওম রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। শরীর ঠিক তো মন ঠিক। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শারীরিক সুস্থতা অত্যাবশ্যকীয়।
ইবন সিনা সাওমকে দুরারোগ্য সব রোগের চিকিৎসা বলতেন। মিশরে নেপোলিয়ানের আগ্রাসন পরবর্তী যুগে হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য সাওম রাখতে বলা হতো।

সুন্দর সমাজ গঠন

সাওমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভুক্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুধাবন করা যায়, ফলে সমাজে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। সাওম সাধনা সহমর্মিতা শিক্ষা জাগ্রত করার কার্যকর মাধ্যম। অনাহার কাকে বলে, খাদ্যাভাব কাকে বলে যারা অনুভব করে নি, তারা সমাজের বঞ্চিত ও পীড়িত মানুষের কষ্ট কীভাবে বুঝবে? সাওম রাখার কারণে এই মানুষগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণা সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা পাবে। ফলে প্রতিবেশি ও কাছে অবস্থানকারীদের কষ্টের জীবন কিছুটা অনুধাবন করা সহজ হবে। সাওম রাখার কারণে শরীরের শক্তি কমে আসবে। তখন

অধীনস্থদের কাজের ভার লাঘব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। আর এতে মনিব-ভৃত্যের দূরত্ব কমে একে অপরের পরিপূরক মনে করার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে বৈরিতা থাকবে না।

সাওম পালনের দ্বারা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা, দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা, ক্ষমা, পরোপকারিতা, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি সদাচরণ জন্মায়। সাওমের এ মহান শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রমযান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি দান সদকা করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে, ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ূর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।”[1]

তাই সাওম পালনের দ্বারা সমাজের দারিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে সাওম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনসহ সর্বস্তরে অনুশীলনের দীক্ষা দিয়ে যায়। তাই আসুন, সাওমের প্রকৃত শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের প্রতি যত্নবান হয়ে সাওম পালনের মাধ্যমে নিজেদের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করি, মানবিক গুণাবলিতে জীবনকে আলোকিত করি; তাহলে আমাদের সাওম সাধনা অর্থবহ হবে। তখন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে সুমধুর সম্পর্ক, বিদায় নেবে অরাজকতা, অন্যায়-অনাচার এবং দুর্নীতি ও ভেজালমুক্ত হয়ে আদর্শ জাতি হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। সাওমের মাসের পরিসমাপ্তি বয়ে আনুক সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন, আল্লাহভীতি, আত্মসংযম ও মানবপ্রেম। সাওমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে যেন সারা জীবন সৎভাবে অতিবাহিত করে আল্লাহর অশেষ করুণা ও ক্ষমা লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের সে তাওফীক দান করুন। আমীন।

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২।

রমযান ও সাওমের ফযীলত

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ» «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

“সাওম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চেয়েও উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সাওম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ”।[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

“যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়”।[2]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

“রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নমের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়”।[3]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».

“শয়তান ও দুষ্ট জিন্নদেরকে রমযান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে

পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ থেকে থাকে।"[4]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

"তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের ওপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সাওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনের কারণে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল।"[5]

ওয়াসিলা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»

"রমযানের প্রথম রাত্রিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর সহীফা নাযিল হয়, রমযানের ছয় দিন অতিবাহিত হলে (মূসা আলাইহিস সালামের ওপর) তাওরাত নাযিল হয়, তের রমযান শেষে (ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর) ইঞ্জিল নাযিল হয়, আঠারো রমযান শেষ হলে (দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর) যাবুর নাযিল হয় এবং চব্বিশ রমযান শেষে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর) কুরআন নাযিল হয়।"[6]

কা'ব ইবন উজরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন,

«احْضَرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: «آمِينَ» فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِينَ»

"তোমরা মিম্বার নিয়ে আসো, ফলে আমরা মিম্বার নিয়ে আসলাম। যখন তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন, বললেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে আবার বললেন, আমীন। অনুরূপ পভাবে তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসলে আমরা জিজ্ঞেস

করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আমরা আজ যা শুনলাম ইতোপূর্বে কখনও এরূপ শুনি নি। তিনি বললেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসলেন, তিনি বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান পেলো অথচ নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, আমি বললাম, আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলাম জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার ওপর দুরূদ ও সালাম পেশ করল না। আমি বললাম, আমীন। আবার আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলাম তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে বৃদ্ধ অবস্থায় তার পিতামাতা দু'জনকে বা একজনকে পেল অথচ তাদের সেবা যত্ন করে জান্নাতে যেতে পারল না। আমি বললাম, আমীন।"[7]

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ, ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: ثُمَّ تَلاَ ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ , ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ, ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

"আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একদিন চলার সময় আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি 'আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।তিনি বললেন, তুমি তো বিরাট একটা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য বিষয়টি অবশ্য সহজ। আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সাওম পালন করবে, বায়তুল্লাহর হজ করবে। এরপর তিনি বললেন, সব কল্যাণের দ্বার (দরজা) সম্পর্কে কি আমি তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিব? সাওম হলো ঢালস্বরূপ, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি সদকাও গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় আর হলো মধ্য রাতের সালাত। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]

“তারা (মুমিনরা গভীর রাতে) শয্যা ত্যাগ করে।” [সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৬]তারপর বললেন, তোমাকে এই সব কিছুর মাথা ও বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ স্বরূপ আমল সম্পর্কে অবহিত করব কি? এরপর বললেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হলো জিহাদ। এরপর বললেন, এ সব কিছুর মূল পুঁজি সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব কি? আমি বললাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন, এটিকে সংযত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমরা যে কথাবার্তা বলি সে কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমাদের মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু‘আয! লোকদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এ যবানের কামাই ছাড়া আর কি কিছু আছে নাকি?”[৪]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সাওম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে ‘আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবন ফুলাইহ্ রহ. তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে ‘আরশে রহমান।”[9]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامِ

الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ»

"আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার ওপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদে কেও তা আমল করতে আহবান জানাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের অঙ্গুলে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রমযান মাসে সাওম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা। আর আমি তোমাদের শুষ্ক লাউয়ের খোলে তৈরি পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরি পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিপ্ত মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।"[10]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭৯।

[3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৭৯।

[4] তিরমিযী, হাদীস নং ৬৮২, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ পরিচ্ছেদে আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ, ইবন মাস'ঊদ ও সালমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবন মাজাহ, ১৬৪২। আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। নাসায়ী, ২১০৭।

[5] নাসায়ী, হাদীস নং ২১০৬, আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমদ, ৭১৪৮, শু 'আইব আরনাঊত বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

[6] আল 'মুজামুল কাবীর লিততবরানী, হাদীস নং ১৮৫। জামে'উস সগীর ওয়াযিয়াদাহ, হাদীস নং ২৩৭৭। আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি হাসান, দেখুন, সহীহ জামে'উস সগীর, হাদীস নং ১৪৯৭। শু'আবুল ঈমান লিলবাইহাকী, ২০৫৩। অধিকাংশ বর্ণনায় ২৪শে রমাদানের কথা উল্লেখ আছে, অর্থাৎ ২৫শে রমাদান রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। তবে

মু'জামুল কাবীর এর বর্ণনায় ২৪শে রমাদানের পরিবর্তে ১৪ই রমাদান এসেছে।

[7] মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৭২৫৬, ইমাম হাকিম রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম কেউ উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী রহ. সহীহ বলেছেন। আবূ হুরাইরা, আনাস ও জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে। দেখুন, তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪৫। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[8] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। ইবন মাজাহ, ৩৯৭৩। মুসনাদে আহমাদ, ২২০১৬। মুহাক্কিক শু 'আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি বিভিন্ন সনদে সহীহ।

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

[10] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৯৫।

* আল্লাহর রাস্তায় সাওমের ফযীলত

আবু সঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সাওম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।"[1]

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৪০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৩।

*সাওম ঢালস্বরূপ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

“সাওম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের ঘ্রাণের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সাওম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন।”[1]

সা‘ঈদ ইবন আবু হিন্দ রহ. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ مُطَرِّفًا، رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

“বনী ‘আমের ইবন সা‘আসা‘আ গোত্রের মুতাররিফ রহ. তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওসমান ইবন আবু ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দুধ পান করার জন্য তাকে দুধ নিয়ে আসতে বললেন। তখন মুতাররিফ রহ. বললেন, আমি সাওম পালনকারী। ওসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সাওম এমন ঢালস্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।”[2]

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১।

[2] সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ২২৩০, সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৬৪৯। হাদীসটি সহীহ।

সাওম পালনকারীর জন্য জান্নাতে রাইয়্যান দরজা

সাহল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

“জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।”[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»

“যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাঁকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব, যে সালাত আদায়কারী, তাঁকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। সে মুজাহিদ তাঁকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে সাওম পালনকারী, তাঁকে রাইয়্যাব দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী তাঁকে সদকা দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, সব দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাঁদের মধ্যে হবে।”[2]

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»

“তারা (সাওম পালনকারী) তাদের নিয়ত অনুসারে কিয়ামতের দিন উত্থিত হবেন।”[1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সাওম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে”[2]

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১১৮।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১।

অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের ওপর ফিতনার আশংকা করে তার জন্য সাওম পালন করা

আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

“আমি আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে চলতে ছিলাম তখন তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, তিনি বললেন, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা সাওম তাঁর প্রবৃত্তিকে দমন করে”।[1]

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৫।

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।